হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 2, Issue No. 1, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 1.00, December 2011

"মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের অদ্ভূত অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক মুসলমান প্রীতি যে ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবের কি গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে ---একদিন ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাহার বিচার করিবে।"

—ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বিখ্যাত ঐতিহাসিক

নতুন নতুন স্থানে সংহতির পদক্ষেপ

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার মছলন্দপুরে হিন্দু সংহতি-র প্রথম প্রকাশ্য কর্মসূচী। সাড়া জাগানো শোভাযাত্রা।
পথসভায় বক্তব্য রাখছেন অভিজিৎ মিশ্র, মঞ্চে উপবিষ্ট অজিত অধিকারী, তপন ঘোষ ও অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়।

গত ২০ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার ধামুয়া গ্রামে হিন্দু সংহতির প্রথম প্রকাশ্য কর্মসূচী পালিত হল। কিছুদিন আগেই ধামুয়াতে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমান উত্তেজনা তৈরী হয়েছিল। সেই অজুহাতে পুলিশ প্রশাসন হুমকি দিচ্ছিল যে সংহতিকে সভা করতে দেবেনা। অনেক রকম আইন দেখিয়ে ও ফন্দি করে এই সভা আটকানোর চেষ্টা করেছিল পুলিশ। পর্দার পিছনে নাটের গুরু অবশ্যই ছিল মুসলিম তোষণকারী রাজনৈতিক দল এবং তৃণমূলের এমএলএ গিয়াসুদ্দিন মোল্লা। কিন্তু সংহতি নেতৃত্ব শক্ত মনোভাবের পরিচয় দেওয়ায় পুলিশ অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। তারপরেও প্রশাসন সংহতির শোভাযাত্রা আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে প্রায় ৫০০ হিন্দু যুবকের শোভাযাত্রা এবং প্রায় ৪ ঘন্টা ব্যাপী সভা অনুষ্ঠিত হয় ধামুয়া মৈত্রী সংঘের মাঠে। বক্তা ছিলেন সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ, সহসভাপতি বারিদবরণ গুহ, ফলতার বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাহিত্যিক অমরেশ মুখার্জ্জী, এডভোকেট তপন বিশ্বাস, উস্তি ব্লকের সংহতি কর্মী প্রতাপ হাজরা, রতন সরদার প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেন সমর সরদার এবং সঞ্জয় নস্কর।

ওই একই দিন সন্ধ্যায় সভা হয় বারুইপুর থানার রামনগরের নিকট শশাটি গ্রামে।

মছলন্দপুরের সভা

গত ২৬ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ লাইনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান মছলন্দপুরে সংহতির প্রথম প্রকাশ্য পথসভা আয়োজন করা হয়। পার্শ্ববর্তী বনগাঁ ও চারঘাট থেকে কর্মীরা এই সভায় যোগ দেয়। সভার আগে এখানেও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। অনেক হিন্দু মহিলার উপস্থিতিতে শোভাযাত্রা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই সভায় বক্তব্য রাখেন তপন ঘোষ, অজিত অধিকারী, অভিজিৎ দাস, সুষেন বিশ্বাস, অভিজিৎ মিশ্র এবং সুশান্ত রায়। সভাপতিত্ব করেন অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়।

মন্দিরবাজারে কিশোরী মেয়ের সর্বনাশ

এত বড় অবিচার কি ধরিত্রীমাতা সহ্য করতে পারবেন ?

এইরকম লজ্জাজনক ঘটনা কি চলতেই থাকবে ?

শিয়ালদা লক্ষীকান্তপুর লাইনে মাধবপুর ষ্টেশনের সামনেই বর্ধিষ্ণু হিন্দু গ্রাম রঘুনাথপুর। অনেক শিক্ষিত ও চাকুরীজীবি হিন্দুর বাস এই গ্রামে। দরিদ্র এক হিন্দুর ১৭ বছর বয়সী মেয়ে পাপিয়া দাস (পরিবর্তিত নাম) গত ১৬ নভেম্বর দুপুরে বাড়ির পিছনেই মাঠে একটি পুকুরে গিয়েছিল মাছ ধরতে। অনেকটা সময়ের পরেও পাপিয়া না ফেরায় তার বাড়ির লোক পাপিয়ার খোঁজে মাঠে যায় এবং সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও অজ্ঞান অবস্থায় পাপিয়াকে মাঠে পড়ে থাকতে দেখে। তার গলায় গামছা জড়ানো ছিল। কোনক্রমে তার জ্ঞান ফিরে আসলে সে তার উপর অত্যাচারের কাহিনী বাড়ির লোককে জানায়। সে বলে, চারজন মুসলমান ছেলে ওই মাঠ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা পাপিয়াকে একা পেয়ে জাপটে ধরে মাটিতে শুইয়ে দেয় এবং তাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। কতজন এবং কতবার তাকে ধর্ষণ করা হয় তা সে ভালভাবে বলতে পারে না কারণ সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তবে ওই ৪ জনের মধ্যে একজনকে সে চিনতে পেরেছে। তার নাম হালিম বৈদ্য, পিতা নাসির বৈদ্য, গ্রাম-দাদপুর।। পাপিয়ার গলায় গামছার দাগ দেখে বাড়ির লোক ও গ্রামের লোকরা অনুমান করছে যে গণধর্ষণের পর তার গলায় গামছা জড়িয়ে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাকে মৃত ভেবেই দুষ্কৃতিরা তাকে ফেলে রেখে চলে যায়।

তাড়াতাড়ি পাপিয়াকে নিকটবর্তী নাইয়ারহাট প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়, কিন্তু পাপিয়ার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ দেখে ডাক্তাররা সেই দিনই ডায়মন্ড হারবার মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ডাক্তার এ. বারিক যত্ন সহকারে তার চিকিৎসা করেন এবং বলেন যে পাপিয়াকে কলকাতার বাঙ্গুর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা — চারদিন পর পাপিয়াকে চরম অসুস্থ অবস্থায়ও জোর করে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় এবং ডাক্তার এ.বারিক ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে লেখেন —No External or Internal Injury, এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে রেফার করে দেন। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে তিনি চাপে পড়ে এই চরম পাপ কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন।

পাপিয়ার ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর আশপাশের গ্রামের সর্বসাধারণ হিন্দু উত্তাল হয়ে ওঠে। দু'দিন ধরে রাস্তা অবরোধ চলতে থাকে। তৃতীয় দিনে মুসলিমরাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা মাধবপুর রেল লাইন অবরোধ করে। এবং রঘুনাথপুর গ্রামের উপর বোমা মারে। হিন্দুরাও প্রতিরোধে এগিয়ে যায়। তখন ১৯ তারিখে পুলিশ ও র‍্যাফ আসে এবং দু'পক্ষকে সরিয়ে দিয়ে শান্তি বজায় রাখে। কিন্তু গ্রেফতার করে ৪ জন হিন্দু ও ২ জন মুসলিমকে।

এলাকায় অনেকেরই অভিযোগ যে তৃণমূলের নেতৃত্ব, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চৌধুরী মোহন জাটুয়া পুলিশের উপর প্রভাব খাটিয়ে মুসলিম দুষ্কৃতিদের গ্রেফতার করার হাত থেকে রক্ষা করেন।

উত্তর রাধানগর ষ্টেশন দখলের চেষ্টা

শিয়ালদা ডায়মন্ড হারবার লাইনে উত্তর রাধানগর রেল ষ্টেশনে এখনও পর্যন্ত হিন্দুদের আধিপত্য। এই লাইনে একটাকা দু'টাকা দামে ঠান্ডা জল পাওয়া যায়। স্থানীয় ভাষায় বলে 'ফটাস্'। প্লাটফর্মে একটি দোকানে গত ৬ অক্টোবর সকাল ১০ টায় একটি মুসলিম ছেলে এই পানীয় চায়। খাওয়ার পর বলে এটা ঠান্ডা ছিল না, তাই দাম দেবে না। বিক্রী করছিল একটি ছোট ছেলে, হিন্দু। সে বার বার দাম চাইতে থাকে। তখন মুসলিম ছেলেটি তাকে জোরে থাপ্পড় মারে। কাছেই দাঁড়িয়েছিল এক সংহতি কর্মী সন্দীপন মন্ডল। সে তীব্র প্রতিবাদ করে ও হিন্দু ছেলেটিকে বাঁচায়। মুসলিম ছেলেটি ছুটে পালিয়ে যায়। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই পাশের শ্যামপুর গ্রাম থেকে প্রায় ৫০ জন সশস্ত্র মুসলিম যুবক নিয়ে ফিরে আসে এবং সন্দীপন ও ষ্টেশনে অন্য হিন্দুদের মারধর করে।

কয়েকজন বয়স্ক মুসলমান এগিয়ে এসে মিটমাটের চেষ্টা করে। কিন্তু আক্রমণকারী দুষ্কৃতকারীরা ষ্টেশনে বোমা চার্জ করতে থাকে। সমস্ত লোক প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায়। তখন দুষ্কৃতিরা ষ্টেশনে রঞ্জিত সরদারের ঠান্ডা পানীয়ের দোকান, রবীন হালদারের ফলের দোকান, নন্দরানী শীলের পানের দোকান ভাঙচুর করে। ষ্টেশনের টিকিট কাউন্টার ভাঙে এবং টাকা লুট করে। একজন হিন্দু মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয় এবং হিন্দু দেবদেবীর নামে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করা হয়।

এই ঘটনার পর এলাকায় হিন্দুদের মধ্যে কিছুটা চেতনা ফেরে ও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু তারা যখন মগরাহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যায়, থানার অফিসার তাদের অভিযোগপত্র তো নেয়ই না, উল্টে সঞ্জয় হালদার ও কার্ত্তিক মন্ডলকে ধমক দেয় যেহেতু তারা হিন্দুদের নেতৃত্ব করছিল। মগরাহাট থানার এই রকম কাপুরুষের মত আচরণ মুসলিম দুষ্কৃতিদের ঔদ্ধত্য আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ঝিনকিতে প্রতিরোধ

মগরাহাট থানার মোহনপুর ১ নং পঞ্চায়েতের ঝিনকি গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রতিবছরের মত এবারও কবাডি টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমানদের অনেক ক্লাব এতে অংশ গ্রহণ করে। গত ৫ ই অক্টোবর প্রতিযোগিতা চলার সময় খেলার নিয়ম কানুন নিয়ে হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে বিতর্ক উঠল এবং তা বেড়ে গেল। পরিস্থিতি সামাল দিতে যখন খেলার আয়োজক কমিটি হস্তক্ষেপ করল, তখন হঠাৎ কিছু মুসলিম যুবক সব রীতিনীতি অমান্য করে হিন্দুদের নামে গালাগালি দিয়ে পরিবেশকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু মুসলিম যুবক নিকটেই দুর্গাপূজা প্যান্ডেলে হামলা করল, কিছুটা অংশ ভেঙে দিল, পুজার বাসনপত্র ভাঙতে লাগল এবং হিন্দু মেয়েদের উপরেও আক্রমণ করল।

শেষাংশ ২ পাতায়

আমাদের কথা

রাজ্য ও দেশের সমস্যা এক নয়

১০-১১ ই ডিসেম্বর হিন্দু সংহতির চতুর্থ বার্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে হুগলী জেলার মালিয়াতে। এই বৈঠকে সংহতির কাজের পর্যালোচনা করা হবে। রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন পরিস্থিতির সম্বন্ধেও বিশ্লেষণ করা হবে এবং পরবর্তী কর্মপন্থা আলোচনা করা হবে। ১৪ ই ফেব্রুয়ারীর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এবছর আমেরিকা থেকে একজন যিনি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং ইংলন্ড থেকে লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস্—এর একজন বিখ্যাত বাঙালি অধ্যাপক বক্তা হিসাবে আসবেন। এই বৈঠকে সারা ভারতের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করা হবে।

উচ্চস্তরে দুর্নীতি ও বিদেশী ব্যাঙ্কে কালো টাকা — এগুলোই আজ বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে সংসদের ভিতরে ও বাইরে। এই ইস্যুগুলিতে বিজেপিসহ বিরোধী দলগুলি সোনিয়া মনমোহনের সরকারকে ফেলে দেওয়ার একটা সুবর্ণসুযোগ পাবে বলে মনে করছে। হয়ত পাবেও। কিন্তু সবাই জানে যে দুর্নীতিতে কেউই পিছিয়ে নেই। কর্ণাটকে খনি দুর্নীতিতে বিজেপির নেতা মন্ত্রীরা পুরোপুরি জড়িত এবং জেলও খাটছেন। এছাড়া বিজেপি শাসিত রাজ্য উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়ালকে দুর্নীতির অভিযোগে পার্টিই সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। তাই দুর্নীতি সহজে বন্ধ হবে না। এর জন্য চাই জোরালো দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে বাবা রামদেব এবং আন্না হাজারে সেই আন্দোলনই গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র সরকার বিরোধী আন্দোলনে পরিবর্তিত করে ফায়দা তুলতে চাইছে। সচেতন মানুষ এটা আজ বুঝতে পেরেছে। তাই আদবানি নয়, আন্না হাজারের জনপ্রিয়তা ও বিশ্বাসযোগ্যতা আজ তুঙ্গে। মানুষের মধ্যে এই চেতনা আসা খুব দরকার যে, শুধু দুর্নীতি পরায়ণ সরকারকে ফেললেই চলবে না, অন্য সরকার এসেও যাতে দুর্নীতি না করতে পারে তারজন্য দুর্নীতিবিরোধী শক্ত আইন দরকার এবং সেই আইনকে প্রয়োগ করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাও দরকার। আন্না হাজারের জনলোকপাল বিলের সেটাই উদ্দেশ্য, শুধু কংগ্রেস সরকারকে ফেলে দেওয়া মাত্র উদ্দেশ্য নয়। এই কাজে আন্না হাজারেকে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, জম্মু কাশ্মীর ও কেরলের মানুষের সামনে আজ দুর্নীতি জীবন মরণ সমস্যা নয়। সেখানে হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন। রাষ্ট্রব্যবস্থার কাপুরুষতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভন্ডামির মূল্য দিতে গিয়ে এই রাজ্যগুলিতে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। কাশ্মীর থেকে হিন্দু বিতাড়ন সম্পূর্ণ। বাকি রাজ্যগুলিতে প্রক্রিয়া চলছে। অসংখ্য মিনি ও মিডিয়াম সাইজের পাকিস্তান তৈরী হয়ে গিয়েছে এই রাজ্যগুলিতে। সেইসব এলাকা থেকে হিন্দুদের পলায়ন বা মাইগ্রেশন দ্রুতগতিতে চলছে। এই ঘটনার প্রতি চোখ বুজে থাকা যে হিন্দুর জন্য আত্মঘাতী হবে —এটা মানুষকে বোঝাতেই হবে। কাশ্মীরের মতই এই রাজ্যগুলিতেও জাতীয় সংহতি বিপন্ন। হিন্দুর অস্তিত্ব, নিরাপত্তা ও সম্মানও বিপন্ন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই ইস্যুকে তুলে ধরার মত কোন আন্না হাজারে নেই। তাই এই রাজ্যগুলির হিন্দুদেরকে ভাবতে হবে যে, বাংলা ও পাঞ্জাবের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীরা যেমন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় তাদের ঘরের পাশে মুসলিম সম্প্রসারণবাদকে দেখতে পাননি, যার পরিণামে তাঁদের বংশধরদেরকে হতে হয়েছে দেশছাড়া গৃহহারা রিফিউজী, সেই ভুল আবার যেন না হয়। সেই কাজই করে চলেছে হিন্দু সংহতি। তাই এই কাজ একটি ঐতিহাসিক কর্তব্যকে পালন করার কাজ। এই কাজ যারা করবেন, তাঁরা এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবেন। পরবর্তী প্রজন্ম তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

১ম পাতার শেষাংশ

ঝিনকিতে প্রতিরোধ

সঙ্গে সঙ্গে, যেন তৈরীই হয়েছিল, স্থানীয় হিন্দু সংহতির ছেলেরা এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ওই মুসলিম দুষ্কৃতিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিল। দুষ্কৃতিরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গিয়ে নিজেদের বীরত্বের পরিচয় দিল। প্রশাসন এল পরে। তারপর নির্বিঘ্নে সব কর্মসূচী শান্তিতে সমাপ্ত হল।

এর পূর্বে ২৭ সেপ্টেম্বর দিন মহালয়ার দিন পার্শ্ববর্তী মাধবপুর গ্রামে হিন্দু মূর্তির মাথা কাটা হয়েছিল, তাই ঝিনকির হিন্দু যুবকরা মানসিক ভাবেই প্রস্তুত ছিল।

শওকত মোল্লা রাজনৈতিক রং পরিবর্তন করলেন তবুও জীবনতলায় শওকত বাহিনীর রেহাই নেই

ক্যানিং ২ ব্লকের জীবনতলা থানা এলাকায় গ্রামগুলিতে হিন্দুরা দীর্ঘদিন অত্যাচারিত শওকত মোল্লার বাহিনীর হাতে। বহু হিন্দু এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। আবার মৌখালির মত গ্রামে অনেক হিন্দু শওকত বাহিনীর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে গ্রামে ফিরতে পেরেছে। এই থানায় বিরোধী দল বলে কেউ ছিল না। ক্যানিং ২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সিপিএমের নির্বাচিত সভাপতি শওকত মোল্লাই শেষ কথা। রাজ্যের পালা বদলের পর দাপুটে প্রাক্তন মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা ও শওকতের গোপন ষড়যন্ত্র অনুসারে এতদিন সিপিএমের ছত্রছায়ায় থাকা মুসলিম ক্রিমিনালদের বাঁচানোর জন্য পঞ্চায়েত সমিতির সব সদস্যসহ শওকতের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তৃণমূলের একটি লবি এতদিন এই চক্রান্তকে আটকে রাখলেও শেষ পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জী শওকত মোল্লাকে তৃণমূলে গ্রহণ করায় দলে পুরো ক্যানিং এলাকায় হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

গত ২৭ নভেম্বর রাত্রে মৌখালি গ্রাম থেকে একটি পুরানো মাম লায় পুলিশ লুতফর মোল্লা, সাত্তার নস্কর নামে শওকত ঘনিষ্ঠ ২ জন দুষ্কৃতকারীকে গ্রেফতার করে। উদ্ধার করে ৩ টি বন্দুক ও ১৬ টি বুলেট। তাদেরকে জেরা করে ২৯ নভেম্বর শওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ আরও ৪ জন দুষ্কৃতকারীকে নলকড়া গ্রাম থেকে গ্রেফতার করে জীবনতলা থানার পুলিশ। উদ্ধার করে একটি বন্দুক, ২৫ টি তাজা কার্তুজ ও ৭ বোমা। দুষ্কৃতিদের নাম নজরুল গায়েন, সাইদুল গায়েন, সইফুল গায়েন ও সিরাজুল গায়েন। এই নজরুল গায়েন গত বছর হিন্দু সংহতিকে সাহায্য করা এক হিন্দু ব্যবসায়ীর দোকান পুড়িয়ে দিয়েছিল। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কঙ্কর প্রসাদ বারুই জানান, বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে তল্লাশি জারী রাখা হবে। জীবনতলা মানুষের কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। যে থানা এতদিন শওকত মোল্লার বৈঠকখানা রূপে ব্যবহৃত হত, সেই থানারই পুলিশ আজ শওকত চ্যালাদেরই গ্রেফতার করছে।

সুজিত বর্মার মৃত্যুতে দশেরায় আসানসোল অশান্ত

৬ ই অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন আসানসোল শহরে 'কোরা পাড়া হনুমান আখড়া'র শোভাযাত্রা আক্রমণ করে মুসলমানরা। আখড়া সদস্য ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ গুলি চালায় হিন্দুদের দিকে। ১৮ বছরের যুবক সুজিত বর্মার চিবুকের নিচ দিয়ে গুলি ঢুকে কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়।

প্রতিবছরের মতো এবারও এই শোভাযাত্রা যখন শহরের বুকে ব্যস্ত রাস্তা হাটন রোডে মসজিদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, মসজিদ থেকে বলা হয় শোভাযাত্রার বাজনা বন্ধ করতে। আয়োজকরা বন্ধ করে না। তখন মসজিদ থেকে কয়েকজন মুসলমান বেড়িয়ে এসে মাইকের তার ছিঁড়ে দেয়। সংঘর্ষ বেধে যায়, পুলিশ সামাল দিয়ে শোভাযাত্রা পার করে দেয়। ফেরার পথে শোভাযাত্রা যখন রামধনি মোড়ে পৌঁছায়, স্থানীয় মুসলিমরা দাবি করে শোভাযাত্রাকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দিতে হবে। মসজিদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না। পুলিশও সেই দাবী মেনে একই আদেশ দেয়। শোভাযাত্রাকারীরা রাজী হয়না, কারণ এটাই তাদের প্রতি বছরের যাওয়ার রাস্তা। ঐ রামধনি মোড়ের চারি দিকে মুসলমান পাড়া, তারা আবার শোভাযাত্রা আক্রমণ করে। ওখানে বাজারের অনেক দোকান ও গাড়ি ভাঙচুড় করে, তখন পুলিশ গুলি চালায়। খোলা ট্রাকের উপর ডি.জে. চালাচ্ছিল ১৮ বছরের ছেলে সুজিত বর্মা। সে গুলিতে মারা যায়। যদিও পুলিশের দাবি এটা তাদের গুলি নয়। আরও অনেক হিন্দু আহত হয়। ৫ জন আহত হিন্দুকে পুলিশ গ্রেফতার করে ও মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে।

সারা শহরে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। হিন্দুরা নিরুপায় ক্ষোভে ফুঁসছে। তৃণমূল সহ সব রাজনৈতিক দলগুলি মুসলমানদের দালালি করছে। তাদের চাপে রাত্রি থেকে শুরু হয়ে গেল মেথর পাড়ায় পুলিশের রেড। পুরুষমানুষদের তাড়া করা আর তাদের মহিলাদের গালাগালি করা — এই হচ্ছে পুলিশের বীরত্ব। একাদশীর সকাল থেকে আসানসোল শহর স্তব্ধ। আসানসোল আখড়া কমিটি ও নগর দুর্গাপূজা সমন্বয় কমিটির আহ্বানে ৯ অক্টোবর সারাদিনব্যাপী আসানসোল বন্ধ। শহরবাসী ভাবছে, পরিবর্তন হল কই? আগেও তো এই ছিল।

বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা অকেজো

হিন্দুপ্রধান কাকদ্বীপেও মুসলিমদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার

কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র মার্কেটে গোল্ডেন ক্লাবের পরিচালনায় প্রতি বছর ঘটা করে কালী পূজা হয়। এবছর প্রতিমা বিসর্জনের মেশিন ভ্যান নিয়ে ঢোকার সময় একটি গাড়ীর ইন্ডিকেটর ভেঙে যায়। সেই নিয়ে একটি মুসলিম ছেলে ক্লাবের একটি ছেলেকে চড় মারে। ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে গন্ডগোল বাধে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গন্ডগোল মিটেও যায়। কিন্তু ঐ মুসলিমটি প্রচার করে যে তাকে মারা হয়েছে ও তার দোকান লুট ভাঙচুর করা হয়েছে। সেই দিন অধিক রাত্রে অন্য গ্রাম থেকে প্রায় ৫৫ - ৬০ জন মুসলমান এসে হামলা করে। তাদের হাতে ২ ফুট লম্বা একটা করে লাঠি ও কোমরে অনান্য অস্ত্র শস্ত্র থাকে সেই গুন্ডারা পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় লোকদের মারধোর করে। এমনকি মেয়েদেরও মারধোর করে। তখন রাত্রি সাড়ে ১২ টা এর পাশেই একটা ছাত্রাবাস আছে। সেই ছাত্রাবাসের ছেলেদেরও ঘুম থেকে তুলে বাইরে টেনে আনে এবং মারে। ছাত্রাবাসের পাসেই জয়দেব দাস নামে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম গুন্ডাদের এই কাজে প্রতিবাদ করেন। তখন তাঁকেও মুসলিম গুন্ডারা বেধড়ক মারে। সেই মুহূর্তে পুলিশ এসে জয়দেব দাস কে উদ্ধার করে এবং থানায় নিয়ে যায়। তখন প্রায় ২০০ - ২৫০ মুসলমান থানায় জমা হয় এবং থানার ভিতর ঢুকে জয়দেব দাসকে খুন করে দেবে বলে হুমকি দেয়। এই পরিস্থিতি দেখে পুলিশ জয়দেব দাসের নিরাপত্তার জন্য তাকে থানাতেই রেখে দেয়।

পরদিন বেলা ১২ টায় কাকদ্বীপের তৃণমূল বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা-র সামনে মিটিং হয়। তার সামনেই বাবুসাহেব নামে একজন মুসলিম প্রকাশ্যে বলে — কাকদ্বীপে ক'গাছা হিন্দু আছে, সবাইকে টিপে মেরে দেব বাইরে থেকে মুসলমান নিয়ে এসে। বিধায়ক চুপ। সেখানে বিধায়ক এবং কাকদ্বীপ যুব তৃণমূল সভাপতি দেবপ্রসাদ মহাপাত্রকে অসম্মানজনক কথা বলে। মুসলিমরা দাবি করে যে তাদের একজন কর্তা ব্যক্তি বাইরে থেকে আসবে, ততক্ষণ মিটিংয়ে কোন আলোচনা হবেনা। সেই ব্যক্তি কাকদ্বীপের লোকও নয় এবং এই ঘটনার সঙ্গে যুক্তও নয়। তা সত্ত্বেও তাদের দাবি মেনে সবাইকে দু'ঘন্টা বসে থাকতে হয়। সেই ব্যক্তি আসে না। তখন হিন্দুরা প্রতিবাদ করলে মন্টুরাম বাবু ও দেবপ্রসাদ বাবু সবাইকে সান্ত্বনা দেয় যে পাড়ায় বসা হবে।

ওই সময় মশারফ গায়েন হুমকি দেয় যে — 'আমার সাত ভাইয়ের ৪২ জন ছেলে আছে, গোটা পাড়া ফাঁকা করে দেব'। সেখ মোস্তাব আলি বৈদ্য হিন্দুদের অশ্লীল গালাগালি করে বলে যে পুঁতে দেব। তাই শুনে পঞ্চায়েত সদস্য প্রতিবাদ করলে তাকেও মাধবপুরে তুলে নিয়ে যাবে বলে হুমকি দেয়। এবং তাকে ও তার স্বামীকে মারধর করে। মোশারফ গায়েনের ছেলে মোতি হিন্দু দেবতাদের প্রতি অশালীন মন্তব্য করে এবং হিন্দু মেয়েদের উল্টোপাল্টা কথা বলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কাকদ্বীপ মহকুমায় মাত্র ১৬ শতাংশ মুসলমানের বাস। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে আসা অনেক হিন্দু রিফিউজিরও বাস এখানে। এছাড়া অনুকূল ঠাকুর, শ্যামাচরণ লাহিড়ীমশাই প্রভৃতি অনেকের অনেক মন্দির এখানে অবস্থিত এবং তাঁদের শিষ্য সংখ্যাও প্রচুর। এই থানার তেভাগা আন্দোলনের পীঠস্থান উকিলের বাজারে আগে থেকেই মুসলিম দুষ্কৃতিদের অত্যাচার হিন্দুদের ওপর চলছে। আর এই মহকুমাতেই আছে সারা বিশ্বের হিন্দুদের তীর্থস্থান গঙ্গাসাগর। সেই সাগরদ্বীপ তো বামফ্রন্ট আমলে শেখ ইসমাইল-এর হাতেই সিপিএম তুলে দিয়েছিল। সেখানেও মুসলিমদের উৎপাত বেড়েই চলেছে।

সাপকে মাসী ভাবলে বিপর্যয় অনিবার্য

তপন কুমার ঘোষ

(শেষ অংশ)

মুসলমানরা অন্ততঃ আপনার মত অতটা ভন্ড নয়। ওদেরও 'তাকিয়া' (ধর্মের জন্য মিথ্যাচার করা) আছে। তবুও আমাদের সেকুলারদের থেকে ওরা বড় ভন্ড হতে পারেনি। ওদের সামনে গিয়ে আপনি যেই বলবেন - আমরা তোমরা এক, সব মানুষ সমান — তখনই ওদের মনে প্রশ্ন উঠবে, তাহলে মোমিন আর কাফের কারা? খোদাতালা তো কোরাণে বলে দিয়েছেন, মোমিন আর কাফের আলাদা, আলাদা শুধু নয়, তারা পরস্পরের শত্রু। শুধু তাই নয়, মোনিনরা আল্লার প্রিয়, আর কাফেরদেরকে আল্লা একেবারেই দেখতে পারেন না। কাফেরদের জন্য আল্লা দোজখের আগুন সব সময় জ্বালিয়ে রেখেছেন। কাফের কারা? যারা চুরি ডাকাতি করে, খুন করে, ধর্ষণ করে, তারা? না, তারা কাফের নয় যদি তারা আল্লা এবং রসুলকে মানে। যারা চুরি করে না, রাহাজানি করে না, মিথ্যা কথা বলে না, খুন ধর্ষণ করে না, কিন্তু আল্লা না মেনে অন্য দেবতাকে মানে এবং রসুলকে মানে না — তারা কাফের। সেই ছোটবেলা থেকে সরল ও বিশ্বাসী মুসলমানরা মসজিদে মক্তবে মাদ্রাসায় গিয়ে মৌলবী মৌলানা ইমাম ও হুজুরদের কাছ থেকে এই কথা শুনে এসেছে, সাক্ষরেরা কোরাণে হাদীসে পড়ে এসেছে। আর আপনি তাদেরকে গিয়ে বলছেন — 'আমরা তোমরা সমান', 'মোমিন কাফের এক'। তাহলে কি কোরাণ হাদীসে মিথ্যা কথা লেখা আছে? ইমাম মৌলবী সাহেবরা ভুল কথা বলেন? হে আমার উপদেশপ্রদানকারী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা, মুসলিম ভাইদের এই প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে। উত্তর দিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তবে তো তারা ওই 'এক হওয়ার' কথা বুঝতে পারবে, আর গ্রহণ করবে! এখন বলুন, আপনি ওই প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন? বলবেন কোরান ভুল, মৌলবী সাহেবরা মিথ্যা কথা বলেন? আপনি বলবেন তো যে, মোমিন কাফের আলাদা নয়, এক? তাই কাফেরের মোমিন হওয়ার দরকার নেই। যে যার নিজের ধর্ম নিয়ে থেকেই ভগবানেরও প্রিয় হওয়া যায়, আল্লারও প্রিয় হওয়া যায়। মসজিদের চত্বরে দাঁড়িয়ে জুম্মাবারের দুপুরের নামাজের পর ছোট্ট একটা হ্যান্ড মাইক নিয়ে এই কথা গুলো বলবেন তো? যদি বলতে পারেন, তাহলে 'ওরা আমরা' কে এক করার প্রক্রিয়াটা শুরু হবে মাত্র। চলুন শুরু করা যাক। বলুন কোন্ মসজিদে প্রথম যাবেন? চিৎপুরের নাখোদা মসজিদে, নাকি ইমাম বরকাতির টিপু সুলতান মসজিদে? আমার অবশ্য বেশী পছন্দ ক্যানিং লাইনে ঘুটিয়ারী শরীফ। ওখানে গিয়ে এইসব প্রচার করলে আপনার 'কান্ডজ্ঞান' খুব তাড়াতাড়ি ফিরে পাবেন— গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। স্বর্গে শিবপ্রসাদ রায় একটু স্বস্তি পাবেন আপনার কান্ডজ্ঞান ফিরে আসলে। যদি সময় থাকতে কান্ডজ্ঞান ফিরে আসে তাহলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গটা আর পূর্ববঙ্গ হবে না। দেরী হলে পশ্চিমবঙ্গকে বাচাঁনো যাবে না।

চেষ্টা করি মূল জায়গায় ফিরে আসার। আমার দৃষ্টিতে মুসলমানরা সাপ নয়। মুসলমানরা মুসলমান। 'হিন্দু আর মুসলমান সমান', 'ওরা আমরা এক' এই ধারণাটাই হল আমার মতে সাপ। কারণ এটা ঠিক নয়। এটা ভুল, এটা মিথ্যা। এই মিথ্যাটাকে সত্য বলে মনে করাটাই হল, আমার মতে, সাপকে মাসী বলা। বলা শুধু নয়, মনে করা। সাপকে মাসী ভাবলে, মিথ্যাকে সত্য ভাবলে — সর্বনাশ হবে। আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে, পরেও হবে। সাপের কামড়ে পৃথিবীর ৭০০ কোটি লোক মারা যায়নি। কারণ, লোকেরা সাপকে সাপ বলেই জানে, মাসী বলে ভাবে না। কিন্তু হিন্দুরা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই এই মিথ্যাটাকে সত্য বলে মনে করে, তাই মরে। গান্ধারে মরেছে, সিন্ধে মরেছে, পাঞ্জাবে মরেছে, পূর্ববাংলায় মরেছে, কাশ্মীরে মরেছে। সাপকে মাসী বলে না ভাবলে মরত না।

সুতরাং এখন কর্তব্য কী? পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মৃত্যু শিয়রে। বাংলাদেশ গ্রাস করে নিচ্ছে। মুসলিম এলাকা ছেড়ে হিন্দু পালিয়ে যাচ্ছে। ওই এলাকায় পুলিশ ঢুকতে পারে না। মুসলিমবহুল স্থানে থানা ও ফাঁড়িগুলোতে পুলিশ প্রাণ হাতে করে ভয়ে ভয়ে থাকে। কাপুরুষ নির্বীর্যরা যেমন বাইরে অপমানিত হয়ে ঘরে এসে বৌ-এর উপর বীরত্ব ফলায়, ঠিক তেমনি মুসলমানদের দেশবিরোধী, আইনবিরোধী ও হিন্দুবিরোধী কাজ একটুও আটকাতে না পেরে এবং তাদের কাছে মার খেয়ে ও চোখের সামনে সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস হতে দেখে, পুলিশ নেড়ি কুত্তার মত পালিয়ে এসে হিন্দুদের উপর হম্বিতম্বি করে আর আইন শেখায়। আমার এইসব কড়া কড়া কথায় যারা মনঃক্ষুন্ন তাদেরকে অনুরোধ করব আমাদের ওয়েবসাইটে (hindusamhati.blogspot.com) ২০১০ সালের জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসের ছবিগুলো দেখুন, পুলিশ সম্বন্ধে আমার কথাগুলোর সত্যতা বুঝতে পারবেন। আর সদ্য কুলপিতে গত ২৪ অক্টোবর তারিখে কুলপি থানার বীরপুঙ্গব পুলিশেরা মুসলিম আক্রোশের হামলা থেকে পুলিশ আবাসনে নিজেদের পরিবারের মা-বৌদের শ্লীলতা রক্ষা করতে পারেনি। এরকম ঘটনা পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে শত শত ঘটছে। সংবাদমাধ্যমে তার অতি অল্পই প্রকাশিত হয়। এই তো পুলিশের অবস্থা। পুলিশ হিন্দুকে বাঁচাতে পারবেনা। পশ্চিমবঙ্গকেও পারবে না। তার উপরে হিন্দুরা সাপকে বলছে মাসী। বলছে সব মানুষ এক, মোমিন কাফেরও এক। হিন্দুরা এই অতি সহজ কথাটা বুঝতে পারছে না যে, সব মানুষ এক, ওরা আমরা এক -— এই কথাগুলো কাফেররা বোঝে, মোমিনরা বোঝে না। কারণ তাদের ধর্মীয় শিক্ষায় মোমিন আর কাফের কখনও এক হতে পারে না।

তাহলে কর্তব্য কী? সাধারণ হিন্দুদেরকে ওই সাপকে মাসী বলা ছাড়াতে হবে। তাই যখনই কোন সেকুলার ব্যক্তি 'হিন্দু মুসলমান', 'ওরা - আমরা' এক এই বাণী দিতে আসবে — তখনই তাদেরকে করজোড়ে অনুরোধ করে অথবা ঘাড় ধরে বলতে হবে, এক্ষুনি চলুন কোন মুসলিম এলাকায় আর মসজিদে। সেখানে গিয়ে এই উপদেশগুলো দেবেন। আগে আপনার মুসলিম ভাইদেরকে আর মৌলবীসাহেবদেরকে শেখাবেন — মানুষের মধ্যে মোমিন-কাফেরে কোন তফাৎ নেই, মানুষের একটাই জাত, শিব আর আল্লা এক, জেহাদ করে মানুষ মারলেও সেটাও খুন, অহিংসা শ্রেষ্ঠ, জিন্নার থেকে গান্ধী শ্রেষ্ঠ, পরোপকার ও সৎকাজ করাটাই বড় কথা, আল্লা ও রসুলকে না মেনেও যদি সৎকাজ কর তাহলেও আল্লা খুশী হবেন, মুসলিম উম্মা হিন্দু উম্মা এসব আলাদা হয় না, মানুষের একটাই উম্মা (জাত) মানব উম্মা, ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করতে নেই, মানুষকে ভালবাসতে হয়, সন্তানদের ভাল করে লেখা পড়া শেখাতে হলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এইসব কথা মসজিদের সামনে গিয়ে আগে বলুন। তারপর হিন্দুদেরকে বোঝাতে আসবেন।

এই কাজটা করতেই হবে। মুসলমানদের মাথায় লাঠি মারতে হবে না। তার থেকে অনেক বেশী দরকার এইসব দিব্যজ্ঞানী হিন্দুদের কান্ডজ্ঞান ফেরানো। আমরা তর্ক দিয়ে যুক্তি দিয়ে তা পারব না। এরা দিব্যজ্ঞানের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। এদের কান্ডজ্ঞান ফেরানোর একমাত্র উপায় হল এদেরকে মসজিদে ও মুসলিম এলাকায় পাঠিয়ে তাদের মহামূল্যবান জ্ঞানের মনিমুক্তো ছড়াতে বলা। আর কিছু করতে হবে না। শিবপ্রসাদ রায়ের বই আর স্বামী বিজয়ানন্দের ভাষণের থেকেও দশগুণ বেশী টোটকার কাজ করবে এটা। ওদের কান্ডজ্ঞান ফিরে আসবে গ্যারান্টি।

এতসব কথা আমার মনে এল ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে বকরিদের আগের দিন। গভীর দুশ্চিন্তায় রাতটা বিনিদ্র কাটল। কারণটা বলা দরকার।

১৯৮২ সালের ২০ আগষ্ট কলকাতা হাইকোর্টের মামলায় বিচারপতি এ.কে. সেন এবং বিচারপতি বি.সি. চক্রবর্তী রায় দিয়েছিলেন, বকরিদে কুরবানীর জন্য গোহত্যা করা নিষেধ। এই রায়ের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার ১৯৮৩ সালেই সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে। আপীল নং ৬৭৯০/৮৩। দীর্ঘ ১২ বছর মামলা চলার পর ১৬.১১.৯৪ তারিখে প্রদত্ত রায়ে সুপ্রীম কোর্টের ৩ জন বিচারপতির বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে বহাল রাখেন এবং কুরবানীর জন্য গোহত্যা নিষিদ্ধ করেন। বাংলার প্রতিটি মানুষ জানে যে এই রায় পালিত হয় না। গরু কাটা অবাধে চলতে থাকে। তাই ২০১০ সালে আবার কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করা হয় বকরিদে গোহত্যা বন্ধ করার জন্য। ১৩৭৮/১০ নং রিট পিটিশনের এই আবেদনের বিচারে ১২.১১.১০ তারিখে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাজ্য সরকারকে আবার আদেশ দেন গোহত্যা বন্ধের জন্য। তারপরও কয়েক লক্ষ গরু কাটা হয়। অল্প কিছু হিন্দু কোর্টের আদেশ পালন করার জন্য গোহত্যায় বাধা দেওয়া নয়, শুধু রাস্তায় নেমে সামান্য প্রতিবাদ করতে যায়, মুসলমানরা তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে (হাওড়া সাঁকরাইলের ঘটনা), এবং পুলিশ প্রতিবাদী হিন্দুদেরকে মেরে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। হাইকোর্ট থাকে গঙ্গার ধারে, আর পুলিশ সর্বত্র নিরাপদে নির্বিঘ্নে গরু কাটাকেই Protection দেয়। হাইকোর্টের প্রাণ থাকলে, মান অপমান বোধ থাকলে ঐ চূড়াওয়ালা বাড়িটা মা গঙ্গায় প্রবেশ করত। এই পরিস্থিতিতে এবছর ২০১১ সালে আবার একাধিক মামলা করা হয় হাইকোর্টে, যদিও তার কোন প্রয়োজনই ছিল না, কারণ ২০১০ সালের রায়েই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলে দিয়েছিলেন যে বকরিদে কুরবানীর জন্য গোহত্যা বন্ধে এই হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের রায় আগে থেকেই আছে। তা সত্ত্বেও অবাধে গোহত্যা চলায় তা বন্ধের আবেদনের একটি মামলার রায়ে গত ১৯.১০.১১ তারিখে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি সৌমেন সেন বকরিদে গোহত্যা নিষেধ করেন। আর একটি মামলায় যার রিট পিটিশন নং ১৬৭৪৯/১১, স্বয়ং প্রধান বিচারপতি মিঃ জে. এন. প্যাটেল এবং বিচারপতি অসীম কুমার রায় আরও কড়া আদেশ দিয়েছেন গত ২.১১.১১ তারিখে। মহামান্য বিচারপতিদ্বয় এই আদেশে রাজ্য সরকারকে মুখ্য সচিবের (চিফ সেক্রেটারি) মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছেন যে বকরিদে গরু কাটা তো বন্ধ করতেই হবে, এমনকি যে সমস্ত অস্থায়ী গোহাট বসেছে, সেগুলোও বন্ধ করতে হবে, এবং কুরবানীর জন্য গরুর চলাচলও বন্ধ করতে হবে। আর কোন আদেশ দিতে বাকী থাকল কি? কিন্তু সবাই জানে লক্ষ লক্ষ গরু পশ্চিমবঙ্গে কাটার জন্য আনা হয়েছে। গরুর বাজার কয়েক হাজার বসেছে। পাড়ায় পাড়ায় গরু বেঁধে রাখা আছে। ৭ নভেম্বর সকাল থেকেই প্রকাশ্য রাস্তায় গরু কাটা শুরু হয়েছে। গলার নলি কাটা গরু রাস্তায় পড়ে ছটফট করছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা। পার্ক সার্কাস, মেটিয়াবুরুজে হিন্দুরা বাড়ির ছোটদেরকে দূরে আত্মীয় বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বড়রা দরজা জানালা বন্ধ করে বসে আছে। ভাবছে আর ক'বছর এখানে থাকা যাবে? বোধ হয় ২-৩ বছরও থাকা যাবে না।

এইরকম এক পরিস্থিতিতে কোর্টের আদেশ ও আইনের পালন করার জন্য পুলিশ প্রশাসন কী করছে? তাদেরও মেধা ও বুদ্ধির অভাব নেই। ইদের আগে থেকেই ১০৭ ধারায় প্রতিবাদী ও সম্ভাব্য প্রতিবাদী হিন্দুদেরকে গ্রেপ্তার করা শুরু করে দিয়েছে। উদ্দেশ্য — এই ত্যাঁদড় হিন্দুগুলোকে থানার লক আপে পুরে বাকী হিন্দুদেরকে ভয় দেখিয়ে ঘরে আবদ্ধ রাখা, যেন কেউ জবাই-এর জায়গায় না যায়, প্রতিবাদ না করে, আর থানায় ডায়েরী বা F.I.R. করতে না আসে। থানায় লিখিত অভিযোগ জমা না পড়লে সহজেই কোর্টকে পরে বলে দেওয়া যাবে যে, গরু কাটা হয়নি। এমনই নির্লজ্জ দুকান কাটা প্রশাসন ও তাদের পরিচালক সরকার। সুতরাং, সরকার তার কর্তব্য পালন করল না। কিন্তু এটা তো গোপন কথা নয়। জনসাধারণ কি এটা জানে না? জানে। কিন্তু এনিয়ে তারা চিন্তিত নয়। তারা চিন্তিত শচীন-সৌরভের ভবিষ্যৎ নিয়ে। জনসাধারণ দেখেছে, কোর্টের আদেশ মেনে কালীপূজায় শব্দবাজি বন্ধ করতে পুলিশের তৎপরতা। জনসাধারণ দেখছে দুর্গাপূজা কালীপূজা এবং সমস্ত পূজার বিসর্জন তাড়াতাড়ি করিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশের প্রচেষ্টা। অথচ সমস্ত মসজিদের বেআইনী মাইক বন্ধ করতে, রোজার মাসে প্রত্যেক শুক্রবার সমস্ত জায়গায় রাস্তা বন্ধ করে নামাজ পড়া আটকাতে, বেআইনী গরু কাটা বন্ধ করতে, সবেবরাতের দিন শব্দবাজি বন্ধ করতে — পুলিশের এতটুকু তৎপরতা তো নেই-ই, বরং এই বেআইনী কাজগুলো যাতে মুসলমানরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, এই সমস্ত বেআইনী কাজে যেন কোনরকম বাধা সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিত করতে পুলিশ ও প্রশাসন (BDO,SDO,DM) তৎপর। প্রশাসনের আচরণের এই দু'রকমের নীতি কি শিক্ষিত সচেতন মানুষদের চোখে পড়ে না? শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের চোখে পড়ে না? শীর্ষেন্দু, শক্তি, সুনীল, অপর্ণা, সৌমিত্র, অমর্ত্য, সুজাতদের চোখে পড়ে না? এই দ্বৈত আচরণ সম্বন্ধে তাঁরা একটাও কথা বলেন না কেন? একটা গল্প কবিতা নাটকও লেখেন না কেন? এটাও কি ভোটলোভী রাজনৈতিক নেতাদেরই দোষ? এই দ্বৈত আচরণের পিছনে কারণটা কী, মানসিকতা কী এবং এর পরিণাম কত ভয়ংকর হতে পারে, সে সম্বন্ধে কি কেউ একটু ভাববেন না? সব দোষ কি সত্যিই রাজনৈতিক দলগুলোর? তারা না হয় মুসলমান ভোটের জন্য ওদের সব অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু শক্তি সুনীল, সঞ্জীব শংকর- এরা তো ভোটেও দাঁড়ান না, দলও করেন না, তাহলে এরা এই দু-মুখো আচরণের প্রতিবাদ করেন না কেন?

শুধু শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরাই নন, সাধারণ মানুষেরও একইরকম আচরণ। গত বছর দেগঙ্গায় অতবড় ঘটনা হল। কোন খবরের কাগজে বের হল না। কিন্তু দেগঙ্গার সাধারণ মানুষেরা কি মুখে মুখে, ফোন করে তাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুদেরকে ওই ঘটনার কথা জানিয়েছেন? তাদের এম.পি হাজী নুরুল ইসলামের জঘন্য সাম্প্রদায়িক আচরণের কথা বলেছেন? বলেন নি। সুতরাং, প্রশাসনের এই দ্বৈত আচরণের পিছনে শুধু ভোটলোভী রাজনৈতিক দল ও নেতারাই দায়ী নয়। এর পিছনে এক সার্বিক মানসিকতা কাজ করছে। সেই মানসিকতার শিকার সবাই — দল, নেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ সবাই। মানসিকতাটা হল এই — মুসলমানরা দেশের আইন মানবে না, নিয়ম নীতি মানবে না। তার উপর তারা হিংস্র এবং একজোট। জোর করে তাদেরকে দিয়ে আইন মানাতে গেলে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একজোট হয়ে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যে সামলানো যাবে না, বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হবে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে যাবে। সুতরাং ওদের উপর জোর খাটিয়ো না। তার থেকে হিন্দুরা তো শান্ত। ওদেরকে চুপ করিয়ে রাখ। ওদের জায়গা দখল করে নেয়, ওদের মন্দির অপবিত্র করে, মূর্তির গলা কেটে নিয়ে যায়, ওদের মেয়েদের হাত ধরে টানে, ওদের বিসর্জন বা ধর্মীয় শোভাযাত্রায় আক্রমণ করে, ঠাকুর ভেঙ্গে দেয়, মেয়েদের রেপ করে — মুসলমানরা যাই করুক না কেন হিন্দুদেরকে চুপ করিয়ে রাখ, ওটা সহজ। ওটাই শান্তি বজায় রাখার সহজ উপায়। এই সহজ উপায়টা রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনই শুধু নয়, সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীরাও মেনে নিয়েছে।

এই হল মানসিকতা। কিন্তু এর পরিণামটা কী? ওই সম্প্রদায় আধুনিকতাকে গ্রহণ করবে না, পরিবার পরিকল্পনা মানবে না। জন্ম নিয়ন্ত্রণ করবে না। তাদের সংখ্যা ও অনুপাত বেড়েই যাবে। সেই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা দেশের আইন, হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের আদেশ কিছুতেই মানবে না। আর তাদের এই না মানাটা অন্যরা মেনে নেবে, এটা গত ৬৪ বছরে তারা বুঝে গেছে। সুতরাং, এই প্রবণতাটাও তাদের বেড়েই চলেছে। এই বর্ধিত জনসংখ্যা ও আইন না মানার বর্ধিত প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে কি একটা খুব বড় রকমের সংকট সৃষ্টি করবে না? এই বঙ্গ যে কারণে বিভাজন হয়েছিল, আমার নিজের ভিটেমাটি শত্রু দেশে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, সেই কারণটাই কি আবার তৈরী হচ্ছে না? ১৯৪৭ সালে হয়েছিল, আবার সেই পরিণামের দিকেই আমরা কি খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিনা? অর্থাৎ আবার একবার বাংলাভাগ, এবং তা ইসলামীকরণের দ্বারা ভাগ — সেইদিকেই কি যাচ্ছি না? তার মানে কি বাঙালী হিন্দু আর একবার রিফিউজী হওয়ার জন্য মনে মনে তৈরী হয়ে গেছে?

(সমাপ্ত)

মগরাহাটের ভয়ঙ্কর ঘটনা

কিছু প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না

গত ১ লা ডিসেম্বর মগরাহাট থানার নৈনান গ্রামের মুসলিম অধ্যুষিত মল্লিক পাড়ায় যে ঘটনাটি ঘটল তার জের বহু দূর গড়াবে। ২ জন মুসলিম মহিলা নিহত — সম্ভবত পুলিশের গুলিতে। বহু পুলিশ ও মুসলিম গ্রামবাসী গুরতর আহত। স্বয়ং এসডিপিও তিনিও আহত। রাজ্যের সব বিরোধী দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুসলিমদের জন্য সমবেদনার থলি নিয়ে এবং রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে দোষারোপ করতে। কিন্তু কয়েকটি তথ্য ও প্রশ্নকে তারা সবাই সযত্নে চাপা দিচ্ছেন। ১) মুসলিম অধ্যুষিত ওই গ্রামবাসীরা হুকিং করে বিদ্যুৎ চুরি করত কিনা? ২) বিদ্যুৎ দপ্তরের লোকসান কমাতে ওই হুকিং খুলতে যাওয়া কি বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মচারীদের অন্যায় হয়েছিল? ৩) গ্রামবাসীরা বলেছে তারা নাকি দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেও বিদ্যুৎ পাননি, কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তরের বিবৃতি অনুসারে মাত্র ১৬-১৭ টি আবেদন পত্র জমা আছে। ৪) দীর্ঘদিন ধরে এই হুকিং চলছে, কিন্তু বামফ্রন্ট জমানায় তা খোলার চেষ্টা করা হয়নি। কেন? ৫) এই বিদ্যুৎ চুরির লোকসানের টাকা কি বামফ্রন্টের মন্ত্রী এমএলএ-রা দিতেন না আমাদের মত সাধারণ মানুষের পকেট থেকে যেত? ৬) বিরোধীরা অভিযোগ করছেন যে বিদ্যুৎ দপ্তর ঢ্যাড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে হুকিং খুলতে গিয়ে ছিল বলেই এই গন্ডগোল। তাহলে কি আইন ভঙ্গকারী সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া এবং বেআইনি কাজ বন্ধ করতে সুযোগ দেওয়া বিদ্যুৎ দপ্তরের অন্যায় হয়েছে? সরকারি কাজ কি দপ্তর গুলিকে চোরের মত চুপি চুপি করতে হবে? ৭) চুপি চুপি হুকিং খুলে দেওয়ার পর গ্রামবাসীরা আবার হুকিং লাগিয়ে দিলে তার প্রতিকার কী? ৮) ৬ টি পুলিশের গাড়ী কারা পুড়িয়ে দিল? এগুলি কি গুলি চালানোর পরে পোড়ানো হয়েছে না আগে? (আগে হয়েছে)। সব রাস্তা বন্ধ করে বিদ্যুৎ পষর্দের কর্মচারী ও পুলিশদের আটকে ফেলা হয়েছিল। এবং মুসলিম জনতা অত্যন্ত হিংস্র আক্রমণ করেছিল তাদের উপর। তাই প্রাণ বাঁচাতেই কি পুলিশকে গুলি চালাতে হয়নি? ৯) রেজিনা বিবির গায়ে গুলি লেগেছিল একটি নির্মীয়মাণ বাড়ীর দোতালায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়। অর্থাৎ পুলিশ সেই দিকে লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ে ছিল। ঐ ছাদ থেকেই পুলিশের উপর ইঁট ও পাথর ছোঁড়া হচ্ছিল কিনা? ১০) এই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেই মাত্র ৩৮ দিনের মধ্যেই ৩ বার পুলিশের উপর মুসলিম জনতার ভয়ঙ্কর আক্রমণ হল — কুলপি, জীবনতলা ও মগরাহাট। এর মধ্যে কি কোন যোগসূত্র নেই? ১১) অবৈধ কাজ বন্ধ করতে ও দুষ্কৃতকারীদের ধরতে মুসলিম বহুল এলাকায় যেতে পুলিশ ভয় কিনা এবং কত বার যায়? ১২) কেন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরকম অবৈধ কাজ ও দুষ্কৃতকারীদের রক্ষা করতে এত অধিক সক্রিয়তা? ১৩) হুকিং দ্বারা বিদ্যুৎ চুরির ঘটনা মুসলিম বহুল এলাকাতেই অনেক বেশী নয় কি? ১৪) তাহলে চিরকালই কি বিদ্যুৎ দপ্তর লোকসানে চলতে থাকবে? ১৫) বিদ্যুৎ-এর মূল্য আদায় করা যাবে না জেনে প্রাইভেট সংস্থাও বিদ্যুৎ উৎপাদন বা বন্টনের ভার নিতে এগিয়ে আসবেনা। তখন কি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় সব মানুষকে অন্ধকারেই দিনরাত কাটাতে হবে? অথবা মুসলিম মাস্তানদের দ্বারা জেনারেটার ব্যবসা রমরমিয়ে চলবে?

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জী বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সাহস দেখাছেন তা অভিনন্দন যোগ্য। সংখ্যা লঘু এলাকায় অবৈধ কার্যকলাপ রুখতে এবং সংখ্যালঘু দুষ্কৃতকারীদের ধরতে তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু চাপের কাছে নতি স্বীকার করে তিনি মগরাহাট থানার ওসি ও পুলিশের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা সমর্থন করা যায় না। এতে পুলিশ প্রশাসনের মনোবল ভেঙে যাবে এবং রজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। একই সঙ্গে জনসাধারণের উচিত সমস্ত রকম অবৈধ ও তোষামোদকারী কার্যকলাপ রুখতে সরকারকে সমর্থন করা। জনসাধারণের বোঝার চেষ্টা করা উচিত যে ফুরফুরা শরীফের ত্বহাসিদ্দিকি ও তসলিমা নাসরিনকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতিদের আওয়াজ যে এতটা কমে গিয়েছে তার কারণ কী?

হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার সন্তোষপুর গ্রামে ৮ অক্টোবর, ২০১১ হিন্দু সংহতি-র বিজয়া সম্মেলন

মগরাহাট থানার ধামুয়া মৈত্রী সঙ্ঘ মাঠে ২০ নভেম্বর হিন্দু সংহতি আয়োজিত 'হিন্দু সম্মেলন'

বারুইপুর থানার কল্যাণপুরে বিজয়া সম্মেলন, ৯ অক্টোবর। মঞ্চে উপবিষ্ট দীনবন্ধু ঘরামী, অ্যাডভোকেট সোমরাজ গাঙ্গুলী, সমর ভট্টাচার্য্য, জীবনকুমার সাহা। বক্তব্য রাখছেন তপন ঘোষ।

দীনবন্ধু মন্ডল মেয়েকে বাঁচাতে পারল না

সন্দেশখালি থানার উত্তর নলকরা গ্রামের বাসিন্দা দীনবন্ধু মন্ডল। সরল সাদাসিধে মৎস্যচাষী, বড় সাধ করে দুই মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন। বড় মেয়ে দীপান্বিতা ভাঙড় কলেজে ভূগোলে অনার্স নিয়ে পড়ছিল। দেখতে খুবই সুন্দর। গত ২২.০৭.২০১১ তারিখে সে চলে গেল বেকার ছেলে আনারুল মোল্লার সঙ্গে। আনারুল বেকার ছেলে তবে বাপ ওয়াছেল মোল্লা বড়লোক। গ্রামের মাতব্বরও বটে। সরল দীনবন্ধু ওয়াছেল মোল্লাকে গিয়ে ধরল, কাতর অনুরোধ করল মেয়েকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। ওয়াছেল মোল্লা দীনবন্ধুকে খুবই আশ্বস্ত করল — তোমার মেয়ে আমার মেয়ে। তাকে খুঁজে পেলেই তোমার বাড়িতে আমি নিজে ফিরিয়ে দিয়ে আসব। সেই কথা শুনে দীনবন্ধু থানায় ডায়েরী করতে দেরী করল। কয়েকদিন পর আনারুল ঐ মেয়েকে নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরল। ওয়াছেল ধুমধাম করে ছেলের বিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত কোর্টে উঠে মেয়ে বলল যে সে মা বাবার সঙ্গে থাকতে চায় না, আনারুলের সঙ্গে থাকবে। গ্রামের মুসলমানরা এবং আনারুলের ভাই আলাউদ্দিন বলে বেড়াচ্ছে — দীনবন্ধুর মেজ মেয়েটাকেও এইবার নেব। সে একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। দীনবন্ধুর ছোট মেয়েটির বয়স চারবছর। মেজ মেয়েকে দীনবন্ধু মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

দীর্ঘদিন থেকেই এই সন্দেশখালি থানার গ্রামগুলিতে হিন্দু মেয়েরা লাভ জেহাদের শিকার হচ্ছে। থানার পুলিশ বিশেষ করে একজন হিন্দু অফিসার এই কাজে খোলাখুলিভাবে মদত দিয়ে চলেছে, বিনিময়ে সে পাচ্ছে অনেক টাকা। এই থানারই ঘটনা ছিল নয়না সরদার অপহরণ।

১৫ বছরের চৈতালী হালদার লাভ জেহাদের শিকার

হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার জয়নগর সরদার পাড়ার বাসিন্দা উৎপল হালদার। তার মেয়ে চৈতালী হালদার, বয়স ১৫ বছর চৈতালী স্কুলে পড়তে পড়তে প্রেমে পড়ল রাজীবের। যখন সে জানতে পারল ছেলেটির পুরো নাম রাজীব খান, তখন আর তার ফেরার উপায় নেই। ৬ই অক্টোবর চৈতালী নিখোঁজ হয়ে গেল। তার মা বাবা পাগলের মতো পাঁচলা থানায় ছোটাছুটি করতে লাগলো। কিন্তু তারা জানেনা যে এই অঞ্চলের পাঁচলা, জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড় প্রভৃতি থানাগুলির পুলিশরা এরকম ঘটনা প্রচুর সংখ্যায় দেখতে অভ্যস্ত। তাই তাদের অত গা নেই চৈতালীকে উদ্ধার করার জন্য। বছরের পর বছর ধরে যখন অন্য চৈতালীরা ঠিক এইভাবেই হারিয়ে গিয়েছিল, তখন কি এই চৈতালীর বাবা মা একটুও নড়েচড়ে বসেছিল? এক পা এগিয়ে গিয়ে সেইসব চৈতালীদের বাবা-মার পাশে দাঁড়িয়েছিল? তাদের সঙ্গে একবারও থানায় বা কোর্টে গিয়েছিল নিজেদের কাজের সামান্য ক্ষতি করে?

তাই রাজীব খানদের লাভ জেহাদের শিকার হয়ে চৈতালীরা হারিয়ে যেতেই থাকবে। তাদের জীবনে নেমে আসবে ধ্বংস। বোরখার অন্ধকারে ঢেকে যাবে তাদের ভবিষ্যত। তবু সমাজের অন্য চৈতালীদের মা-বাবার কান্ডজ্ঞান ফিরবেনা। আর রাজনৈতিক নেতারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী ছড়াবেন ও ধর্মগুরুরা 'সব ধর্ম সমান' — এই উপদেশ দিতে থাকবেন। শেষ পাওয়া খবর অনুসারে, চৈতালী উদ্ধার হয়নি এবং রাজীব খান ৫০ হাজার টাকা দাবি করেছে চৈতালীকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

বিশেষ ঘোষণা ঃ

'হিন্দু সংহতির' সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫ নং ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ১২

(শিয়ালদহের নিকট শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সামনে), **ফোন নং ঃ ০৩৩-৬৫৩৫ ৩৪৭৪ এবং ৯১৬৩১ ২২২১১**

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.blogspot.com>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <www.hindusamhati.org>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans.
Editor's Name & Address : Prokash Chandra Das, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012